আনন্দবর্ধনাচার্যকৃতো

ধ্বন্যালোকঃ

(প্রথমোদ্দ্যোতঃ ও দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ)

(মূল, বঙ্গানুবাদ, লোচনটীকা,
বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহিত)

অঞ্জলিকা মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

অলংকারশাস্ত্র

অলংকার যেমন দেহের বিশেষতঃ নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ধন করে, তেমনি রচনার সৌন্দর্য সম্পাদন করে যা, তাও অলংকার। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিতে আচার্য বামন (৮ম শতাব্দী) অলংকার শব্দের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমটি ভাববাচ্যনিষ্পন্ন অলংকার শব্দ, অলংকৃতিরলংকারঃ, যার দ্বারা কাব্যের যে কোনো শোভাকর ধর্ম অলংকার নামে পরিচিত হল। দ্বিতীয়টি করণবাচ্যে নিষ্পন্ন, অলংক্রিয়তে অনেন, এর দ্বারা উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি পারিভাষিক অলংকারকে বোঝাল। এই ব্যাখ্যাবলে গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতি সমগ্র কাব্যশোভাকর উপাদান 'অলংকার' শব্দের দ্বারা পরিচিত হল এবং তাদের আলোচনা যে শাস্ত্রে করা হত, তা অলংকার শাস্ত্র নামে প্রতিষ্ঠিত হল।

অলংকার শাস্ত্রের পোষাকি উত্থান অনেক পরের কথা। যেদিন থেকে মানুষ নিজের মনের ভাবকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছে, সেদিন থেকেই তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার ইচ্ছাও অনুভব করেছে। তাই বৈদিক সাহিত্যেও অজস্র অলংকারের উদাহরণ পাওয়া যায়। যাস্কাচার্যও এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি উপমার লক্ষণ করেছেন—'যদ্ অতৎ তৎসদৃশম্, সা উপমা'। সুতরাং দেহ সজ্জিত করলে যেমন তার আবেদন (impression) বাড়ে, তেমনি ভাষা সজ্জিত হলে তার প্রভাব (impact) অধিক হয়, এ কথা অতি সুপ্রাচীন কালেও লেখকরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে এই বিষয়টি যখন শাস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটাল এবং যুগ যুগ ধরে তার ক্রমবিকাশ চলতে থাকল, তখন তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

সাহিত্যতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের মতে অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়।[১] প্রথমটি ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র রচনা থেকে নবম শতকে রুদ্রটের কাব্যালংকার রচনা পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি নবম শতাব্দীতেই আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক রচনা থেকে শুরু। এই পর্যায়ে যেমন ধ্বনিবাদী, রসবাদীরা আছেন, তেমনি ধ্বনিবিরোধীরাও রয়েছেন। তৃতীয় পর্বটিকে সমন্বয় পর্ব বলা চলে। এতে তেমন নতুন চিন্তার উন্মেষ দেখা যায় না। এঁদের অধিকাংশই ধ্বনিতত্ত্বের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তবে প্রাচীন মতও সম্পূর্ণ পরিহার করেননি। এঁদের মধ্যে মম্মটভট্ট (কাব্যপ্রকাশ, ১১শ শতাব্দী), বিশ্বনাথ-কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণ, ১৪শ শতাব্দী), পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ (রসগঙ্গাধর, ১৭শ শতাব্দী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অলংকারশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কীরূপ রচনাকে কাব্য বলা যাবে? এই আলোচনায় যুগে যুগে মতের পরিবর্তন হয়েছে। এক এক সম্প্রদায় এক একটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী নামকরণও হয়েছে, যেমন, অলংকারপ্রস্থান, রীতিপ্রস্থান ইত্যাদি। সংক্ষেপে এই সকল প্রস্থানের আলোচনা করা হচ্ছে।

অলংকারপ্রস্থান—

এই সম্প্রদায়ের মতে কাব্যে অলংকারই প্রধান শোভাকর বস্তু। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষে অথবা অষ্টম শতকের পূর্বভাগে আবির্ভূত ভামহকে এই প্রস্থানের প্রাচীনতম আচার্য বলে মনে হয়। (তবে প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত আচার্য দণ্ডী ভামহের পূর্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী এই বিষয়ে তুমুল বিতর্ক রয়েছে।) ভামহ রচিত গ্রন্থটির নাম 'কাব্যালংকার'। তাঁর মতে শব্দ ও অর্থ মিলে কাব্য গঠিত হয় (শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্) সেজন্য অলংকারও দ্বিবিধ— শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

অষ্টম খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে উদ্ভটের আবির্ভাব। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম অলংকারসারসংগ্রহ। এতে ছয়টি অধ্যায়ে ৪১টি অলংকারের আলোচনা আছে।

১. আচার্য আনন্দবর্ধন ও ধ্বন্যালোক, পৃ. ৪, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, মার্চ ১৯৯১

প্রধানতঃ ভামহকে আদর্শ করে তিনি এই আলোচনা করেছেন। 'ভামহালংকারবিবরণ' নামে তাঁর একটি টীকাও আছে।

এরপর নবম খ্রিস্টাব্দে এলেন রুদ্রট। তাঁর গ্রন্থের নামও কাব্যালংকার, এতে ১৬টি অধ্যায় আছে। নমিসাধু এই গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার।

দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে রুয্যকের অলংকারসর্বস্ব গ্রন্থ এই প্রস্থানের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

রীতিপ্রস্থান—

রচনার রীতিই (Style) কাব্যের উৎকর্ষজনক— এবং গুণ সেই রীতির প্রাণ— এই প্রস্থানের মূল বক্তব্য এইটি। দণ্ডীকে এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম আচার্য বলে মনে করা হয়। তাঁর গ্রন্থের নাম কাব্যাদর্শ। এতে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে। তিনি রীতিকে মার্গ আখ্যা দিয়েছেন এবং গুণের আধারে বৈদর্ভ ও গৌড় এই দুই মার্গের বিশদ আলোচনা করেছেন। এছাড়া দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থালংকার ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে শব্দালংকারের আলোচনা আছে। তরুণ বাচস্পতি এই গ্রন্থের উপর হৃদয়ঙ্গমা নামক বিখ্যাত টীকা রচনা করেন।

দণ্ডীর গ্রন্থে প্রথম মার্গভেদ দেখা গেলেও রীতি প্রস্থানের প্রকৃত প্রবর্ত্তক আচার্য বামন। অষ্টম শতকের শেষভাগে বা নবম শতকের প্রথম ভাগে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর গ্রন্থের নাম কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই গ্রন্থের বৃত্তিও তার রচনা। পাঁচটি অধ্যায়ে ও দ্বাদশ অধিকরণে বিভক্ত এই গ্রন্থে ৩১৯টি সূত্র আছে। তিনি বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী-তিন প্রকার রীতি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' অর্থাৎ রীতিই কাব্যের আত্মা। রীতিসম্প্রদায় কিন্তু তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি।

ধ্বনিপ্রস্থান—

ধ্বনিতত্ত্বের প্রবর্ত্তক আচার্য আনন্দবর্ধন যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী। অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থ রচনার পর কাব্যতত্ত্বসমীক্ষার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছিল।